॥ কাদম্বরী কথা কাব্যের বঙ্গানুবাদ ॥

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধকালে সংস্কৃত সাহিত্য অনুবাদের যে প্রয়াসে চলিতে থাকে তাহাতে বাণভট্ট রচিত 'কাদম্বরী' কাব্যের বঙ্গানুবাদে প্রায় আটজন অনুবাদকের রচনা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে মাত্র তিনখানি অনুবাদের বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া হইল। অন্যান্য গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। অনূদিত গ্রন্থের কালানুক্রমিক তারিখ অনুসারে নিম্নে অনুবাদকগণের নাম ও গ্রন্থের কাল নির্দ্দেশ করা হইল।

প্রথম অনুবাদক তারাশঙ্কর তর্করত্ন 'কাদম্বরী' কাব্যের অনুবাদ করেন ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার অনুবাদ প্রচেষ্টা মূলানুসারী হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকাংশেই তিনি মূলের বহু অংশ বর্জন করেন এবং কোন কোন স্থলে বর্ণনীয় বিষয় মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে।

দ্বারকানাথ মুন্সী ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে [১৭৮২ শক] 'কাদম্বরী' কাব্যের অনুবাদ করেন। [১]

---

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার ক্যাটালগে এই অনুবাদ গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু অধুনা এই গ্রন্থখানি অপ্রাপ্য।

মণিমোহন সরকার বাণভট্টের 'কাদম্বরী' অবলম্বনে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে 'মহাশ্বেতা নাটক' প্রণয়ণ করেন।[২]

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে [১২৬৬ সাল] দ্বারকানাথ কুণ্ডু মূল 'কাদম্বরী' অবলম্বনে কাদম্বরী [গদ্য] কাব্যের অনুবাদ করেন বলিয়া জানা যায়।[৩]

পরবর্তী অনুবাদক নিমাই চাঁদ শীল। তিনি এই কাব্যের অনুবাদ করেন ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে।[৪]

---

২. ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে [২য় খণ্ড] এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'এডুকেশান গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রে জনৈক দর্শকের একখানি পত্রে জানা যায় –

> "বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকের অভিনয় হয়। ইহা বাণভট্ট প্রণীত সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের অনুর্গত। সংস্কৃত গ্রন্থ নাটক নহে। বাবু মণিমোহন সরকার অভিনয় জন্য নাটকচ্ছলে তাহা রচনা করিয়াছেন। ..... স্থানে স্থানে সঙ্গীতগুলিও উৎকৃষ্টরূপে রচিত হইয়াছে। বোধ হইল স্থল বিশেষে তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রণীত 'কাদম্বরী' গ্রন্থের অবিকল অনুলিপি হইয়াছে।...

৩. ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে [২য় খণ্ড] এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

৪. নিমাই চাঁদ শীল 'কাদম্বরী' কাব্য যে অনুবাদ করেন তাহা ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে [২য় খণ্ড] ~~রহিয়াছে~~ উল্লেখ করিয়াছেন।

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "ষড়ঙ্গ কাদম্বরী নাটক" নামে মূল কাদম্বরী কাব্যের অনুবাদ করেন ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে।[৫]

গৌরসুন্দর চৌধুরী 'কাদম্বরী গীতাভিনয়' নাম দিয়া ইহার অনুবাদ করেন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে [১২৮৫ শক]। তিনি যে গীতাভিনয়ের উদ্দেশ্যেই এই নাটকের অনুবাদ করেন তাহা 'বিজ্ঞাপন' অংশেই উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টম অঙ্কে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় এবং উপসংহার অংশও এখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল কাহিনীকে অনুবাদক গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অনূদিত অংশের অনেকটাই তাঁহার স্বকীয় বর্ণনা।

"কাদম্বরীর বিবাহ কি সম্বন্ধ" অনূদিত হয় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। নাটকাকারে গ্রন্থটি রচিত হইলেও নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামের সহিত মূলের কোনো মিল নাই। তাহাছাড়া অনূদিত বিষয়বস্তুর প্রায় সকল ঘটনাই অনুবাদকের কল্পিত রচনা। মূলের সাদৃশ্য যাহা আছে তাহাও অতি নগণ্য।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' গ্রন্থখানিকে মূলের ভাবানুবাদ বলা চলে। আখ্যানভাগের দিক দিয়া যে সব বর্ণনা অপ্রয়োজনীয় মূলের সেই সমস্ত অংশ বর্জন করিয়া তারাশঙ্কর অতি সংক্ষেপে মূল বিষয়বস্তুর অনুবাদ করেন।

---

৫. কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'ষড়ঙ্গ কাদম্বরী নাটক' নামে মূল কাদম্বরী কাব্যের যে অনুবাদ করেন তাহাও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় খণ্ড] – সুকুমার সেন–এই গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। এই জন্য মূল গ্রন্থের উপক্রমণিকায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে তারাশঙ্করের অনুবাদে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই এবং রাজা শূদ্রকের বর্ণনা ও চণ্ডাল কন্যার বর্ণনা আলোচ্য অনুবাদে থাকিলেও মূলের তুলনায় তাহা অতি সংক্ষিপ্ত।

রাজার স্নানের বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখিয়াছেন –

" অনন্তর রাজা সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কতিপয় সুহৃদ সমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় স্নান, পূজা, আহার প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিয়া বৈশম্পায়নের আনয়নের নিমিত্ত প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন।"[১]

ইহা সংক্ষিপ্তানুবাদের লক্ষণ। মূল গ্রন্থে রাজার স্নানের যে সুন্দর ও অলঙ্কার সমৃদ্ধ বর্ণনা রহিয়াছে তাহা তারাশঙ্কর একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপে মূলে কিরাত সৈন্যের যে দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে সে অংশের অনুবাদে অনুবাদক সম্পূর্ণ বিরত রহিয়াছেন। অথচ কোন কোন স্থলে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশের প্রায় অবিকল অনুবাদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন – বৈশম্পায়নের জীবনতৃষ্ণা যে কত প্রবল ছিল তাহা তারাশঙ্করের দৃষ্টিও এড়ায় নাই। তিনি লিখিয়াছেন –

" তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম কি আশ্চর্য!
যত দুর্দ্দশা ও যত কষ্ট সহ্য করিতে হউক না কেন,

---

১. রাজার স্নানের বর্ণনায় কবি বাণভট্ট একস্থলে লিখিয়াছেন –

"বিততসিতবিতানাম্, অনেক চারণগণ নিবদ্ধমানমঙ্গলাম্
গন্ধোদকপূর্ণ কনকময় দ্রোণী সনাথমধ্যাম্, উপস্থাপিত
স্ফটিক স্নানপীঠাম্, একানুনিহিতৈরভি সুরভি–গন্ধ–সলিলপূর্ণৈঃ
পরিমলাবকৃষ্ট মধুকর–ঝঙ্কার–কারিত মুখৈরাতপভয়ান্নীল
কপটাবগুণ্ঠিতমুখৈরিব স্নানকলসৈরুপলোভিতাং স্নানভূমিমগচ্ছৎ।"
– ॥ শূদ্রক স্নানম্ ॥

তথাপি কেহ জীবনতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে
না। আমার সমক্ষে পিতা প্রাণ পরিত্যাগ
করিলেন, স্বচক্ষে দেখিলাম, আমিও বৃক্ষ হইতে
পতিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইয়াছি ;
তথাপি বাঁচিবার বিলক্ষণ বাসনা আছে। হায়,
আমার তুল্য নির্দ্দয় কে আছে ?" ২

ইহা অনেকটা মূলানুগামী অনুবাদ। এই জাতীয় আনবিকতার আবেদন মূলের ন্যায় তাঁহার সংশ্লিষ্ট অনুবাদেও সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

আশ্রমের বর্ণনা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর লিখিয়াছেন —

"মহর্ষিগণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি
প্রদান করিতেছেন এবং প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার উত্তাপে
বৃক্ষের পল্লব সকল মলিন হইয়া যাইতেছে। গন্ধবহ
হোমগন্ধ বিস্তারপূর্ব্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুনি-
কুমারেরা কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে বেদ উচ্চারণ,
কেহ বা প্রণানুভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা

---

২. অতিকষ্টাসু দশাসুপি জীবিত নিরপেক্ষা ন ভবন্তি খলু প্রাণিনাং বৃত্তয়ঃ নাস্তিজীবিতাদন্যদ্ভিমততরমিহ জগতি সর্বজন্তূনাম্।
এবমুপরতেহপি সুগৃহীতনাম্নি তাতে যদহমবিকলোঽস্মিয়ৈঃ পুনরেব প্রাণিমি।
॥ নিজাবস্থাবর্ণনম্ ॥

করিতেছে। মৃগকদম্ব নির্ভয়চিত্তে বনের চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। শুকমুখভ্রষ্ট নীবার কণিকা তরুতলে পতিত রহিয়াছে।"৩

— বাণভট্টের সুদীর্ঘ বর্ণনার তুলনায় ইহা খুবই সামান্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে এইরূপ বর্ণনায় সংক্ষিপ্তানুবাদের প্রতিই তারাশঙ্করের লক্ষ্য ছিল।

বাণভট্টের উজ্জয়িনীবর্ণনার সহিত তারাশঙ্করের বর্ণনার সাদৃশ্য নাই বলিলেই হয়। রাজা তারাপীড় কিরূপে যৌবনসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা সংক্ষেপে আলোচ্য অনুবাদে থাকিলেও নারী সাহচর্য্যের কোন উল্লেখ অনুবাদে নাই। অনুবাদক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূলের অনুসরণ না করিলেও কাহিনীর গতি মোটামুটি পূর্বাপর সংযোগ রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

উজ্জয়িনী নগরের বিলাসী লোকদিগের স্বভাব যে কত নম্র ছিল তাহার বর্ণনার আড়ম্বর মূলে রহিয়াছে বটে, কিন্তু তারাশঙ্কর এই বর্ণনায় সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন। তাহাছাড়া মূলের ন্যায় সকল শিশুর বর্ণনার আতিশয্যও এখানে পরিলক্ষিত হয় না।

---

৩. "যত্র চ মলিনতা হর্বিধুমেষু ন চরিতেষু, মুখরাগঃ শুকেষু ন কোপেষু তীক্ষ্নতা কুশাগ্রেষু ন স্বভাবেষু, চঞ্চলতা কদলীদলেষু ন মনঃসু, চক্ষুরাগঃ কোকিলেষু ন পরকলত্রেষু কণ্ঠগ্রহঃ কমণ্ডলুষু ন সুরতেষু, মেখলাবন্ধো ব্রতেষু ন ঈর্ষ্যাকলহেষু .... মিথুনম্ অত্যতি মনোহরো মানবানামগম্যো দিব্যজনসঞ্চরণোচিতঃ প্রদেশো বীক্ষিতঃ। অত্র চ সলিলমন্বেষয়তা শ্রমহারি সিদ্ধজনোপস্পৃষ্টজলং সরো দৃষ্টম্। তত্তীরলেখাবিশ্রান্তেন চাসানুষং গীতমাকর্ণিতম্। তচ্চানুসরতা মানুষদুর্লভদর্শনা দিব্যকন্যকেয়মালোকিতা। নহি মে সংশীতিরস্যা দিব্যতাং প্রতি। আকৃতিরেবানুমাপযত্যমানুষতাম্ কুতশ্চমর্ত্ত্যলোকে সম্ভূতিরেবং বিধানাং গন্ধর্ব্ব ধ্বনিবিশেষাণাম্।"

॥ জাবাল্যাশ্রম ও মহাশ্বেতা বর্ণনা ॥

রাজা তারাপীড় পুত্রহীন থাকায় নিজেকে যেরূপ অসহায় মনে করিয়াছিলেন মূলের ন্যায় সে বর্ণনা অনুবাদেও রহিয়াছে। যেমন –

> " সন্তান না হওয়াতে সংসার অরণ্যজ্ঞান, জীবনে বিড়ম্বনাজ্ঞান ও শরীর ভারমাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং আপনাকে অসহায় ও হতভাগ্য বিবেচনা করিতেন।"[৪]

– এখানে মূলানুসরণের চেষ্টা চলিয়াছে। পুত্রহীনের ব্যথার প্রতি তারাশঙ্করের দৃষ্টি সজাগ থাকিলেও সংক্ষিপ্তানুবাদের লক্ষণ এখানেও স্পষ্ট।

রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় শিক্ষাসমাপনান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন তখন দিবসাবসান ঘটিয়াছে। রাজবাড়ীর সন্ধ্যাকালীন দীর্ঘ বর্ণনায় যাহা উক্ত হইয়াছে অনুবাদের সহিত তাহার বিশেষ মিল নাই। সন্ধ্যাকালের বর্ণনায় অনুবাদক লিখিয়াছেন –

> " এই সময়ে তাপের বিগম ও অন্ধকারের অনুদয় প্রযুক্ত লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হইল।"

---

৪. যথা যথা চ যৌবনমতিচক্রাম, তথা তথা বিফল মনোরথস্যানপত্যতাজন্মাবর্ধতাস্য সন্তাপঃ বিষয়োপভোগসুখেচ্ছাভিশ্চ মনো বিজহে নরপতি সন্ত্রু পরিবৃতমপ্যসহায়মিব, চক্ষুষ্মন্তমপ্যন্ধমিব, ভুবনাধিপমপি নিরালম্বনমিব আত্মানম্ অমন্যত।

॥ অনপত্যতাবিষাদঃ ॥

এইভাবে অনুবাদক দিবসাবসানের ইঙ্গিত দিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজপুরীর সুদীর্ঘ সন্ধ্যাবর্ণনার কোন অনুবাদ এখানে নাই।[৫]

অতঃপর তারাশঙ্কর কর্ত্তৃক 'অচ্ছোদ সরোবরের' ঘটনা, 'দেবমন্দিরের' বর্ণনা ইত্যাদি অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দেবমূর্ত্তির সম্মুখে মহাশ্বেতাকে দেখিয়া চন্দ্রাপীড়ের মনে যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল এখানে সেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না।[৬]

---

৫. "শনৈঃ শনৈশ্চ নিশাবিলাসিনী মুখাবতংস – পল্লবে গলিতে সন্ধ্যারাগে দিক্ষু দিক্ষু বিক্ষিপ্তেষু সন্ধ্যাদেবতার্চ্চনবলিপিণ্ডেষু শিখরদেশ লগ্ন তিমিরাসুনাবৃত ময়ূরাস্বপি ময়ূরাধিষ্টিতাস্বিব ময়ূরযষ্টিষু, গবাক্ষবিবর নিলীনেষু প্রাসাদলক্ষ্মীকর্ণোৎপলেস্বিব পারাবতেষু .... ইত্যাদি।

॥ প্রদোষবর্ণনা ॥ –

৬. "অহো! জগত্তিজন্তুনামসমর্থিতোপনতান্যাপতন্তি বৃত্তান্তরাণি। তথাহি, ময়া মৃগয়ায়াং যদৃচ্ছয়া নিরর্থক মনুবধ্নতা তুরঙ্গমুখ–মিথুনম্ অযমতিমনোহরো ... মানবানামগম্যো দিব্যজনসঞ্চরণোচিতঃ প্রদেশো বীক্ষিতঃ। অথচ সলিলমন্বেষয়তা হৃদয় ...... সিদ্ধজনোপস্পৃষ্টজলং সরো দৃষ্টম্। তত্তীরলেখাবিশ্রান্তেন চামানুষং পীতমাকর্নিতম্। তদেতানুসরতা মানুষদুর্লভ-দর্শনা দিব্যকন্যকেয় মালোকিতা। নহি মে সংশীতিরস্যা দিব্যতাং প্রতি। আকৃতিরেবানুমাপয়ত্যমানুষতাম্। কুতশ্চ মর্ত্ত্যলোকে সম্ভূতিরেবংবিধানাং গন্ধর্ব্ব ধ্বনিবিশেষাণাম্।"

॥ মহাশ্বেতা বর্ণনা ॥

আলোচ্য অনুবাদে অভিসারেরও কোন উল্লেখ নাই।[৭]

গন্ধর্ব্ব রাজকন্যা কাদম্বরীকে দেখিয়া চন্দ্রাপীড়ের ভাবাবেগ মূলে যাহা রহিয়াছে তাহার বর্ণনায় অনুবাদক লিখিয়াছেন। –

"শশীকলাদর্শনে জলনিধির জল যেরূপ উল্লসিত হয়, কাদম্বরী দর্শনে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় সেইরূপ উল্লসিত হইল। মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে লাগিলেন, আহা! আজ কি রমণীয় রত্ন দেখিলাম।"[৮]

অনুবাদ এখানে অনেকটা মূলানুযায়ী হইলেও শেষ অংশটুকুর সহিত মূলের বিশেষ সম্পর্ক নাই।

তারাশঙ্করের অনুবাদে কাদম্বরীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং চন্দ্রাপীড়ের আত্মসংযমের উল্লেখ রহিয়াছে। কাদম্বরী হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বর্ণনায় অনুবাদক লিখিয়াছেন –

---

৭. "প্রয়ান্তী চ তরলিকাদ্বিতীয় সপরিজনম্ আত্মানমলোক্য অচিন্তয়ম্ – প্রিয়তমাভিসরণপ্রবৃত্তস্য জনস্য কিমিব কৃত্যং বাহ্যেন পরিজনেন। নন্বেতে এব পরিজনলীলামুপদর্শয়ন্তি। তথাহি, সমারোপিত-শরাসনাসক্ত-সায়কোঽনুসরতি কুসুমায়ুধঃ, দূরপ্রসারিতকরঃ করমিব কর্ষতি শশী, প্রস্খলন-ভয়াৎ পদে পদেঽবলম্বতে রাগঃ, লজ্জাং দৃষ্টতঃ কৃত্বা পুরঃ সহেন্দ্রিয়ৈর্ধাবতি হৃদয়ম্ নিশ্চয়মারোপ্য নয়ত্যুৎকণ্ঠা ইতি।"

॥ মহাশ্বেতা অভিসারঃ ॥

৮. "তস্য তু দৃষ্টকাদম্বরীবদন–চন্দ্রলেখালক্ষ্মীকস্য সাগরস্যেবামৃত মুল্লাস হৃদয়ম্। আসীচ্চাস্য মনসিঃ শেষেন্দ্রিয়াণ্যপি মে বেধসা কিমিতি লোচনময়ান্যেব ন কৃতানি। কিং বানেন কৃতমবদাতং কর্ম্ম চক্ষুষা যদনিবারিতমেনাং পশ্যতি।"

॥ কাদম্বরী বর্ণনা ॥

"লজ্জা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে কহিলেন,
আমি মোহান্ধ হইয়া কি চপলতা প্রকাশ করিয়াছি।
একজন উদাসীন অপরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে নিঃশঙ্কচিত্তে
কত ভাব প্রকাশ করিলাম। তাঁহার চিত্ত বৃত্তি,
অভিলাষ, স্বভাব, কিছুই পরীক্ষা করিলাম না।
তিনি কিরূপ লোক কিছুই জানিলাম না। অথচ
তাঁহার হস্তে মন, প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিলাম।" [৯]

মূল কাব্যের যেখানে পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে তারাশঙ্কর তাহা হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। গন্ধর্বরাজা হইতে পত্রলেখা উজ্জয়িনীতে আসিয়া কাদম্বরীর অবস্থা বর্ণনার পরই মূল নাটকের যবনিকাপাত ঘটে। তারাশঙ্কর নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া কাদম্বরী এবং চন্দ্রাপীড়ের মিলন ঘটাইয়াই অনুবাদ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনারই অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদে বর্ণনা বিস্তার নাই এবং মাঝে মাঝে বর্ণনীয় অংশ তিনি নির্বিচারে ত্যাগ করেন। ইহাকে মূলের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ বলা চলে। বাণভট্টের ন্যায় উপমা অলঙ্কারের বাহুল্য তারাশঙ্করের অনুবাদে দেখা না গেলেও 'কাদম্বরী' গ্রন্থের অলৌকিক অথচ সরস কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব সহজ ও সরলভাবে তিনি আলোচ্য অনুবাদে পরিবেশন করিয়াছেন।

---

৯. "সমচিন্তয়চ্চৈবম্ – অগণিতসর্বশঙ্কয়া তরলহৃদয়তাং দর্শয়ন্ত্যা
অদ্য ময়া কিং কৃতমিদং মোহান্ধয়া। অথাহি, অদৃষ্টপূর্বোয়োমিতি
নিস্ত্রীকয়া নাকলিতম্। কাস্য চিত্ত বৃত্তিরিতি মূঢ়য়া ন পরীক্ষিতম্।
দর্শনানুকূলাহমস্য নেতি বা তরলয়া ন কৃতো বিচারক্রমঃ।
প্রত্যাখ্যানবৈলক্ষ্যান্ন ভীতম্ গুরুজনান্নত্রস্তম্, লোকাপবাদান্নোদ্বিগ্নম্।"
॥ কাদম্বর্যাঃ সাধকারজাচিন্তা ॥ পৃঃ ৬৫২

কাদম্বরী গীতাভিনয় নাম দিয়া গৌরসুন্দর চৌধুরী 'কাদম্বরী' কথাকাব্যের অনুবাদ করেন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে [১২৮৫]। 'বিজ্ঞাপন' অংশে তিনি লিখিয়াছেন –

> "আমি বহুদিন বিগত হইল, মহাত্মা তারাশঙ্কর প্রণীত 'কাদম্বরী' পাঠে এতাদৃশ তৃপ্তিলাভ করি যে, তদোক্ত অভিনেতাগণের চিত্রাবয়ব আমার মনোমধ্যে সেই পর্যন্ত জাগরূক রহিয়াছে। বলিতে পারি না, কিন্তু 'কাদম্বরী' গ্রন্থের গীতাভিনয় প্রণয়নার্থে আমার আশা এতদূর বলবতী হয় যে তাহা প্রণয়ন না করিয়া কোনক্রমেই আমার মনোক্ষোভ নিবারিত হইল না, সেইজন্য স্বীয় মনেচ্ছা পূরণার্থে এই গীতাভিনয় প্রকটিত করিয়া আপনাদের করে দিলাম, সানুগ্রহ পূর্ব্বক আপনারা এক একবার পাঠ করিলেই, আমার সর্ব্ব আয়াস ও শ্রম সফলিত হইবে। পরিশেষে এই বক্তব্য যে, শ্রীযুক্তবাবু কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহাতে কতিপয় গীত রচনা করিয়া প্রায় অনেকাংশ সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন।"

আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি সেই সময়ে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তনও বেশ লক্ষ্য করা যায়। তখন যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরণের একপ্রকার অভিনয় দেখা গিয়াছিল। এই জাতীয় অভিনয় নাটকের মত হইলেও অভিনয়ে দৃশ্য পটাদির বালাই ছিল না। 'গীতাভিনয়ে'র উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা ১৮৬৫ সনের ১৬ই নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতে পাই –

" প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি-
গণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া
নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায়
কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ
তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ
করিয়াছেন।"

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে গৌরসুন্দর চৌধুরী মূল 'কাদম্বরী' কাব্য-খানিকে গীতাভিনয়ের উদ্দেশ্যেই অনুবাদ করেন। মূল গ্রন্থে বাণভট্ট যেমন উপমা অলঙ্কারের সাহায্যে বহু বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন অনুবাদে সেরূপ বর্ণনার বাহুল্য প্রায় অনুপস্থিত। অনূদিত গ্রন্থের প্রারম্ভেই পুত্রহীনা রাণী বিলাসবতীর আক্ষেপোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

মূল বহির্ভূত অংশের নিদর্শন স্বরূপ গানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন –

রাগিনী সুরট – মল্লার। তাল আড়াঠেকা
কেন লো প্রেয়সী তুমি আছ অধোবদনে।
কি ভাবে এ ভাব তব উদয় মনে ॥ .....

নিঃসন্তান রাজা তারাপীড় ও মহিষী বিলাসবতীর বিষাদপূর্ণ কথোপকথনে মূলের সহিত সামান্য সাদৃশ্য থাকিলেও কিভাবে রাণীর মনোবাসনা পূর্ণ হইবে তাহার বর্ণনায় প্রিয়ম্বদা কর্তৃক গীত এই অনুবাদকের স্বকীয় রচনা। এই গানের বর্ণনায় রহিয়াছে –

রাগিণী হাম্মির । তাল একতালা
উঠ রাণী শোক পরিহর ।
অবশ্য পূরিবে আশা, শিব ব্রত কর ॥
শঙ্কর হলে সদয়, লভিবে উত্তম তনয় ।
কহিনু নিশ্চয়, মম উপদেশ ধর ॥

অনুদিত প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মহাকালের মন্দিরে গিয়া উপাসনা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন ।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের প্রারম্ভেই তারাপীড় বলিয়াছেন –

"তারা [সহাস্য বদনে] অমাত্যবর ! এক্ষণে
আমাদের মনোভিলাষ সম্পূর্ণ হয়েছে ; প্রাণধন
চন্দ্রাপীড় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও সকল বিদ্যায় বিভূষিত
হইয়াছে, অতএব তাকে বিদ্যালয় হতে আনয়নের
জন্য যথাযোগ্য লোকজন সমূহ প্রেরণ কর ।"

ইহাতে বোঝা যায় তারাপীড়ের পুত্রের বিদ্যার্জন সমাপ্ত হইয়াছে । সুতরাং এখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে । মূল গ্রন্থে তারাপীড়ের পুত্রের জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যার্জনের কাল পর্যন্ত যে দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে এখানে তাহার কোন উল্লেখ নাই এবং চন্দ্রাপীড়ের গৃহে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বাণভট্ট যেরূপ সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন তাহারও কোন উল্লেখ এখানে নাই । পুত্রলাভের আকাঙ্খায় রাণীর উপাসনার পরই অনুবাদক আকস্মিকভাবে চন্দ্রাপীড়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করায় মূলের সংযোগ সূত্র ছিন্ন হইয়াছে ।

চন্দ্রাপীড় রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আকস্মিকভাবে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার কথা বলায় চন্দ্রাপীড় রাজার নিকট তীর্থভ্রমণের বাসনা উজ্ঞাপন করিলেন এবং রাজাও তাঁহাকে আদেশ দান করিলেন। এখানেই দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আচ্ছাদ সরোবরের কাননে কপিঞ্জল, পুণ্ডরীক ও বনদেবীর কথোপকথন রহিয়াছে। তাহাছাড়া মূলের ন্যায় মহাশ্বেতার বৈরাগ্যের কারণও এখানে কিছুটা বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মহাশ্বেতার শয়নাগারে তাহার সুগতোক্তি ও গানের সহিত মূলের কোন সম্পর্ক নাই। তবে মূল 'কাদম্বরী' গ্রন্থে অচ্ছোদ সরোবরে মহাশ্বেতার বর্ণনা আছে এখানে সেরূপ বর্ণনা না থাকিলেও মূলে চন্দ্রাপীড়কে মহাশ্বেতা তাহার পূর্ব্বেকার যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু বর্ণনা অনুবাদে রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে পুণ্ডরীক মদনবাণে আক্রান্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলে কপিঞ্জল ও পুণ্ডরীকের মধ্যে যে কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে তাহা এবং সম্পূর্ণ যে সুদীর্ঘ গানের এখানে অবতারণা করা হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ মূলবহির্ভূত। মূল গ্রন্থে দেখা যায় —

> "মহাশ্বেতার শোকে পুণ্ডরীকের প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ায় মহাশ্বেতা সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইলে নেপথ্যে আশার বাণী উচ্চারিত হইল এবং তখনই আকস্মিক ভাবে দুইজন দূত আসিয়া পুণ্ডরীকের দেহ লইয়া গেল ;

মহাশ্বেতা এখানেই রহিয়া গেলেন।—এই ঘটনার সহিত অনুবাদকের আংশিক সাদৃশ্য থাকিলেও অনুবাদকের কল্পনাই এখানে অধিক স্থান লাভ করিয়াছে।

আবার, শিবমন্দিরের সম্মুখে উপবিষ্টা মহাশ্বেতাকে দেখিয়া চন্দ্রাপীড় যাহা বলিয়াছেন গৌরসুন্দর তাহা এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন —

"চন্দ্রা [দৃষ্টে] কি আশ্চর্য! অরণ্যে ভ্রমণ করলে, কত শত অসম্ভাবিত ও অচিন্তিত অপূর্ব্ব বিষয় সকল স্বপ্ন সদৃশ সহসা সন্দর্শন করা যায় সে সকল নিরূপণ করা কার সাধ্য? মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে, কত অদ্ভূত পদার্থ দর্শন করলেম্। তৎপরে বামকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করে এই স্থানে উপবিষ্ট হয়ে অত্যাশ্চর্য অনির্ব্বচনীয় বিষয় দর্শন করতেছি। [অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি] আহা! রমণীর আকার প্রকার দর্শনে মানবী বলে বোধ হয় না, ইনি সুরকন্যা, কি বনদেবী, তা আমি নিশ্চয় বলতে পারি না। যা হোক, যদি ইনি পরলোকবাসী দর্শনে অনুর্হিত না হন, তা হলে নাম ধাম এবং তপস্যার অভিনিবেশ কারণ, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করব।"

— বলা বাহুল্য, ইহা অনেকটা মূলানুসরণের দৃষ্টান্ত।

রাজা চন্দ্রাপীড়ের অনুরোধে মহাশ্বেতা তাহার বৈরাগ্যের কাহিনী এখানে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিস্তৃত না হইলেও অনেকটা মূলানুযায়ী হইয়াছে। মহাশ্বেতার অভিসারের বর্ণনা পূর্ববর্তী অনুবাদের ন্যায় এখানেও অনুপস্থিত।

কাদম্বরীকে প্রথম দর্শন করার পর চন্দ্রাপীড়ের ভাবাবেগের বর্ণনা মূলের ন্যায় এখানে রহিয়াছে। যেমন –

" চন্দ্রা – [স্বগতঃ] আজ অতি রমণীয় রমণীরত্ন দর্শন করে আমার দর্শনেন্দ্রিয় সফল হল, অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী কখনও দেখি নাই। নয়ন তুই জন্ম-জন্মান্তরে কত পুণ্য করেছিলি, সেই পুণ্যফলে কাদম্বরীর মুখারবিন্দ দেখতে পেলি। হায়! যদ্যপি বিধাতা আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় লোচনময় করতেন, তাহলে দর্শন আশা পূর্ণ হত। [ক্ষণেক দর্শানান্তর] কি আশ্চর্য! যতবার দেখি, ততই ও মুখ দেখতে নেত্র বাসনা করে। বিধাতা এরূপ রূপ নির্ম্মাণের পরমাণু কোথায় পেলেন? বোধ হয় যে পরমাণু দ্বারা এই রূপলাবণ্য প্রস্তুত করেছেন তার অবশিষ্ট অংশ দ্বারা কমল কুমুদ ইত্যাদি কোমল পদার্থ সৃষ্টি করেছেন।"

অনুবাদে ভাবাবেগ প্রকাশ পাইলেও ইহা মূলানুসরণের উপযোগী দৃষ্টান্ত নহে। এইরূপ মূল বিষয়কে অনুসরণ করিয়া কাদম্বরীর অনুর্দ্দশা ও চন্দ্রাপীড়ের আত্মসংযমের বর্ণনা অনুবাদে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাও মূলের যথাযথ ভাষান্তর নহে। অষ্টম অঙ্কে গ্রন্থ সমাপ্ত হয় এবং মূলবহির্ভূত উপসংহার অংশও এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে।

"কাদম্বরীর বিবাহ কি সম্বন্ধ" নামক আর একখানি অনুবাদ রচিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। মূল কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে অনুবাদকের নামোল্লেখ

নাই। নাটকাকারে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের সহিত মূল কাদম্বরী গ্রন্থে বর্ণিত নায়ক নায়িকা ব্যতীত অন্যান্য নামের সহিত কোন মিল নাই। আলোচ্য গ্রন্থের সকল বিষয়বস্তুই প্রায় অনুবাদকের স্বকল্পিত রচনা। অনুবাদের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

মূল গ্রন্থে কোন অঙ্ক বিভাগ নাই অথচ অনুবাদক পঞ্চম অঙ্কেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এখানেও ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, নাটক প্রণয়ণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই হয়ত তিনি এই কাব্যখানিকে নাটকাকারে অনুবাদ করেন।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে – কাদম্বরীর বিবাহ ব্যাপারে পিতার ঔদাসীন্য দেখিয়া মাতা মদিরা সহচরীসহ যখন চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছিলেন তখনই চিত্ররথ বয়স্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া রাণীর মনোব্যথার কারণ জানিয়া বলিলেন –

চিত্ররথ – এই তোমার দুঃখ! আমি
ভাবছিলাম আর বা কি হবে –
পরিহর প্রিয়তমে! ও সব ভাবনা
যা আছে বিধির মনে হইবে ঘটনা।

তারপরই বয়স্য কর্তৃক গীত উচ্চারিত হইয়াছে। অতঃপর চিত্ররথের শ্বশুর জটাধারী উপস্থিত হইলে দাসী কর্তৃক রাণীর মনোব্যথার কারণ জানিয়া বলিলেন –

জটা – অবশ্য । – এ অযৌক্তিক কথা নয় –
তবে যাই কাদী শালীর নিকুঞ্জভবনে ,
দেখি দেখি এ যুবারে ধরে কিনা মনে ।

পিতার এরূপ উক্তি শুনিয়া মদিরা বলিলেন – "বুড়ো হলে বাহাত্তুরে পায় ।"

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, গ্রন্থের এই অংশের সহিত মূলের কোন সম্পর্ক নাই । জটাধারী নামে চিত্ররথের শ্বশুরেরও কোন উল্লেখ মূলে দেখা যায় না । এ সকলই অনুবাদকের স্বকীয় কল্পনা ।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কাদম্বরীর প্রমোদবন প্রান্তে রতি ও মদনের প্রবেশ এবং তাহাদের প্রত্যুক্তি ও গীতের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহার সহিতও মূলের কোন সম্পর্ক নাই ।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে – লতামণ্ডপে আসীনা কাদম্বরীর হৃদে চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাদম্বরীর স্বগতোক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে । অতঃপর কাদম্বরীর সখীগণ বালচন্দ্রিকা, কুসুমমালিকা, ইন্দ্রপ্রভা ইত্যাদি এবং জটাধারী বৃদ্ধের যে রহস্যালাপের দীর্ঘ বর্ণনা রচিত হইয়াছে তাহাও অনুবাদকের যথেচ্ছ রচনা ।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে – মহাশ্বেতার আশ্রম চৈত্ররথ কাননের বর্ণনা রহিয়াছে ; এখানে অবশ্য অল্প হইলেও মূলের সহিত সাদৃশ্য অনুভব করা যায় ।

মহাশ্বেতা অতিথিকে দেখামাত্রই সসম্মানে অতিথি সৎকারের পর নিজ বংশের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন, পরে তিনি পুণ্ডরীকের প্রতি তাঁহার যে সুগভীর প্রেম অনুরাগে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও মূলানুসরণের প্রযত্ন সূচিত হয় ।

মহাশ্বেতা রাজকুমার চন্দ্রাপীড়কে একটি পুস্তক প্রদান করিয়া কহিলেন – " এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সমস্ত লিখে রেখেছি – সময়েতে সবিশেষ হইবেন জ্ঞাত ।" – এরূপ পুস্তক প্রদানের ঘটনা মূলে নাই ; তবে মূল গ্রন্থের ন্যায় এখানেও বিবৃত হইয়াছে – কেয়ূরকের নিকট হইতে কাদম্বরী অসুস্থতার সংবাদ জানিয়া মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়ের সহিত হেমকূট পর্বতে গমন করিলেন ।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে – হেমকূট গন্ধর্বরাজ ভবনের বর্ণনা রহিয়াছে । আলোচ্য অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে যুবরাজের প্রতি কাদম্বরীর অনুরাগ, জটাধারীর দীর্ঘ রহস্যালাপ এবং কয়েকজন গন্ধর্ব কর্তৃক কাদম্বরীর এ বিবাহে অমত প্রকাশ করার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে । এই সকল ঘটনা বর্ণনার মধ্যে অনুরাগের কোন লক্ষণ নাই, অধিকাংশই কল্পনা ।

চন্দ্রাপীড়ের প্রতি কাদম্বরীর অনুরাগকে অবলম্বন করিয়া চন্দ্রাপীড়, কাদম্বরী, মহাশ্বেতা ও সখীগণের হাস্যকৌতুকের যে দীর্ঘ বর্ণনা তাহাও মূল বিষয় বর্জিত রচনা ।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে – বহুজন সমাকীর্ণ হেমকূট পর্বত ও সভামণ্ডপের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে ।

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে – চিত্রকূট রাজসভায় চিত্ররথ আসীন এবং তাহার ভক্ত অনুচরগণ মরালচরণ, মকরকেতন ও তারকসূদনের প্রবেশ এবং তাহাদের কথোপকথনের বর্ণনা রহিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের রচনায় অনুবাদকের স্বাধীন কল্পনাই কার্য্যকরী হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে – হরকেলি দুর্গের বর্ণনা আছে এবং কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে বিপক্ষের বাধা যাহাতে না আসে সেই ব্যবস্থার বিবরণও এখানে দেওয়া হইয়াছে। তাহাছাড়া জটাধারী বুড়োর রঙ্গরসের যে দীর্ঘ বর্ণনা আছে তাহাও বেশ উপভোগ্য ; গ্রন্থের স্থানে স্থানেই এরূপ হাল্কা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের যে সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে তাহা পাঠক মনের উপর সরস আনন্দ সঞ্চারের বেশ উপযোগী হইয়াছে বলা চলে।

অনুবাদে বিবাহের নিয়ম কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে জটাধারী প্রভৃতির কৌতুকালাপ এবং গীতের অবতারণা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল অংশ পাঠ করিলে ইহা মূল কাদম্বরীর অনুবাদ না বলিয়া একটি মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম হয়।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে – বাসর ঘরের বর্ণনা এবং মহাশ্বেতা ও সখীগণের দীর্ঘ কথোপকথন এবং গীতের বর্ণনা আছে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে – হরকেলি দুর্গ, রাজপথ, বিদ্যাবুধি বিজ্ঞানসাধক নামক দুইজন পণ্ডিতের প্রবেশ ও কাদম্বরীর বিবাহকে অবলম্বন করিয়া সমালোচনা এবং কুম্ভোদর নামক ভণ্ড ধার্মিক ও সুব্রত নামে যে ধার্মিকের বর্ণনা আছে তাহা অনুবাদকের সম্পূর্ণই কাল্পনিক বর্ণনা।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে – কাদম্বরীর বিবাহের বিরুদ্ধ সমালোচনা রহিয়াছে। এই বিবাহের সমালোচনা দ্বারা সে যুগের সমাজচিত্রের একাংশ পাঠকের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

আবার, পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে – মন্ত্রী শুকনাসের পত্র পাইয়া কাদম্বরীকে মূর্ছিত অবস্থায় মহেশ্বেতার হস্তে সমর্পণ করিয়া চন্দ্রাপীড় স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। কাদম্বরী মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিলেও পুনঃ পুনঃ মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এই সময়ে মহেশ্বেতার সহিত সখীগণ যখন চন্দ্রাপীড় সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন তখনই জটাধারী বুড়ো আসিয়া গান ধরিলেন –

" যত গোল অগ্রে তত শান্তি আছে পরে।
চল সবে আর কেন, যাই অন্তঃপুরে ॥
পাঠক বা নাট্যপ্রিয় যার যার আনন্দ।
পড়ে দেখে বিচারিও বিয়ে কি সম্বন্ধ ॥ "

এই বঙ্গানুবাদের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। অনুবাদক 'কাদম্বরীর বিবাহ কি সম্বন্ধ' নাম দিয়া যে গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন তাহাতে বাণভট্টের অনুসরণেই কাহিনীর গতি অগ্রসর হইয়াছে। এই গ্রন্থের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত কাদম্বরীর বিবাহের ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে; সর্বত্র মূলের তুলনায় অনুবাদকের নিজ কল্পনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অনুবাদক সেই যুগের সমাজচিত্র পাঠকের সম্মুখে কতকটা উপস্থাপিত করিয়াছেন। কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া পণ্ডিতের নানা সমালোচনা এবং ভণ্ড ধার্মিকের জ্ঞানগর্ভ যুক্তি সমাজমানসের অন্যতম প্রকাশ। কিন্তু

স্থানে স্থানে গ্রন্থকার ভাষার ও ভাবের যে লঘুতা দেখাইয়াছেন তাহাতে কাদম্বরী-কাহিনীর গৌরবহানি হইয়াছে। যেমন – বৃদ্ধ মাতামহের যেরূপ কথোপকথন গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহা নীচস্তরের ভাঁড়ামি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। বয়স্কব্যক্তির বয়সোচিত গাম্ভীর্য বা রসবোধের পরিচয় ইহাতে নাই। তাহাছাড়া কাদম্বরীর মাতা মদিরা পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন –

"বুড়ো হলে বাছাদুরে পায়" – পিতার প্রতি এরূপ অশালীন উক্তি উচ্চস্তরের সাহিত্য রচনার নিদর্শন নহে।

আলোচ্য কালপর্বের অনুবাদধারায় কাদম্বরী কাব্যের যে তিনটি অনুবাদ বা ভাবানুবাদ আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্নের অনুবাদই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অনুবাদে বহু ত্রুটি থাকিলেও মূল কাহিনীর ধারাবাহিকতা তিনি বজায় রাখিয়াছেন এবং তাঁহার রচনাকাল এবং মূল গ্রন্থের কথা বিবেচনা করিলে তারাশঙ্করের ভাষার গতিও নিন্দনীয় নহে।

আরও পরবর্তীকালে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কালিদাস দত্ত কাদম্বরীর যে অনুবাদ করেন তাহাও নাটকাকারেই রচিত হয় এবং এখানেও অনুবাদকের নিজস্ব ভাবধারারই প্রাধান্য লাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু এই গ্রন্থ আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে।

পরবর্তী অংশে 'কিরাতার্জুনীয়' ও 'শিশুপালবধ' কাব্যের অনুবাদের আলোচনা রহিল।